ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

বাংলাদেশে ফুল ব্যবসা : চট্টগ্রামের উপর একটি সমীক্ষা

মুন্সি তানিয়া আফছার*

সারাংশ

ফুল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সভ্যতার পরিচয় বহন করে আসছে। আধুনিক সভ্যতায়ও ফুলের মূল্য অপরিসীম ও অনবদ্য। পৃথিবীর সকল সমাজেই ফুলের বিশেষ আবেদন রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ-কৃষ্টিতে ফুলের অবস্থান বরাবরই মর্যাদাজনক। স্বাধীনতার পর থেকে বেড়ে চলেছে ফুলের ব্যবহারিক কদর। আন্তর্জাতিক বাজারেও দেশি ফুলের বাজার সম্ভাবনা আশাপ্রদ। বিশ্ববাজারে শুধু ফুল রপ্তানি করেই কয়েক শ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। ফুলচাষে উৎসাহ প্রদান করার জন্য কৃষিব্যাংক চালু করেছে 'ফুলচাষে ঋণপ্রদান'। বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক ফুলচাষে অর্থায়নের জন্য নীতিমালা জারি করেছে। ফুলের বাণিজ্যিক মূল্য বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন। যাই হোক, এ প্রবন্ধটিতে ফুল ব্যবসায়ের পটভূমি, বাংলাদেশে ফুলচাষ ও ফুলচাষের প্রকারভেদ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফুলের বাণিজ্যের ধারা, চট্টগ্রামে ফুল ব্যবসায়ের বিকাশ, ফুলের বিপণন ব্যবস্থা, ফুল ব্যবহারের বর্তমান প্রবণতা, ফুল ব্যবসায়ের সমস্যা নিরীক্ষণ এবং ফুলের ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য কতিপয় দিক নির্দেশনা রয়েছে। এতে দেখা যাবে, ফুলচাষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নেই। সরকারি উদ্যোগে ফুল রপ্তানির এবং ফুলের রোগ-বালাই দূর করার জ্ঞানের পর্যাপ্ততা এবং চাষব্যবস্থায় উন্নত গবেষণার অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকন্তু ফুলের চাষে প্রণোদনা এবং হরতাল-ধর্মঘটসহ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাজনিত লোকসান থেকে বাঁচার কোনো সুব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে 'পিক-সিজনে' বেশী উৎপাদিত ফুলের সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা দেখা যায় না। বস্তুত ফুলচাষ হচ্ছে এক্ষেত্রে সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিদের কোনো রকমের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াই। ফুলচাষে উৎকর্ষ অর্জন এবং ফুল ব্যবসায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এক্ষেত্রে করণীয়ের মধ্যে রয়েছে– ফুল রপ্তানিতে সরকারি সহযোগিতার ব্যবস্থা করা, ফুলপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করা, ফুল থেকে ফুলজাত সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করার জন্য গবেষণা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো, বিদেশ থেকে অবৈধ ফুল আমদানি বন্ধ করা এবং ফুল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ভূমিকা

ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক। এটি মানব সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ফুলের রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য শুধুমাত্র চোখ ও মনের পিপাসাই নিবারণ করে না, বরং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে ফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে যুগে যুগে দেশে দেশে ফুলের আবেদন সার্বজনীন। আবহমানকাল

*এম.ফিল গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

থেকে এদেশে চলে আসছে ফুলের চাষ ও ব্যবহার। আমাদের দেশে বিগত এক দশকে নাগরিক জীবনে পুষ্পচর্চার ক্রমবিকশিত ধারা লক্ষণীয়। প্রাত্যহিক জীবনে একটি প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য হিসেবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের বাজেটে ফুলের স্থান অবশ্যই নান্দনিক উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। আর সময়ের দাবি পূরণে ফুলের বিপণন এখন একটি স্বীকৃত পেশা। বাংলাদেশে ফুলের বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। গায়ে হলুদ, বিয়ে, জন্মোৎসব, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস-সহ যে কোনো পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্টীয় আচার-অনুষ্ঠানে ফুলের বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন দেখা যায়। শহরে বিয়ের খরচের বাজেটের অন্যতম একটি খরচ হচ্ছে বিয়ের গাড়ি সাজানো, বর-কণেকে বরণ করা, বাসরঘর সাজানো ইত্যাদি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিনিয়ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে রকমারি ফুলের চাষাবাদ। ফুলের ব্যবহারিক কদর বেড়ে চলায় বিভিন্ন স্থানের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠছে ফুলের নার্সারি। অভ্যন্তরীণ বাজারে ফুলের কদর ক্রমাগত বৃদ্ধির মুখে। অনেকেই এখন ফুলের চাষ শুরু করেছে বাণিজ্যিকভাবে। এই সুবাদে শহর বন্দরসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে একের পর এক নার্সারি। বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ফুলের চাষাবাদে পুঁজির চাহিদা তুলনামুলকভাবে বেশ কম। সে হিসেবে স্বল্প পুঁজির আগ্রহী উদ্যোক্তা তথা শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে এ ব্যবসায়ের প্রতি উৎসাহ বেশি। দেশি–বিদেশি চাহিদার মুখে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মতো অনায়াসে ফুলও একটি সম্ভাবনাময় খাত। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতাসহ উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিকল্পিত উপায়ে ফুলের উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের চাহিদাপূরণ করে অন্যান্য অপ্রচলিত পণ্যের মতো ফুল রপ্তানি করেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বিশ্ববাজারে শুধু ফুল রপ্তানি করে কয়েকশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের (নন্দী ১৯৯৮)। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে ফুলের চাষাবাদ ও উৎপাদনে যে খরচ হয়, সে তুলনায় বাংলাদেশে ফুলের বাণিজ্যিক উৎপাদানে প্রাতিষ্ঠানিক খরচ পড়ে এক–তৃতীয়াংশ (কামাল ১৯৯৫)। এ অবস্থায় দেশীয় ফুল নিয়ে আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজার ধরা কোনো কঠিন কাজ নয়।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ৪০ প্রজাতির ফুলচাষ হচ্ছে। কৃষিখাতে উৎপাদনে চলছে নীরব বিপ্লব। দেশের ৮টি জেলার শত শত একর জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত ফুল ভারতের একাংশের বাজারও দখল করছে (রেহমান ২০০১)। প্রয়োজনীয় আনুকুল্যে রপ্তানিমুখী কৃষিভিত্তিক পণ্য হিসাবেও ফুল উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্যিকভাবে ফুল উৎপাদনে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে গত ক'বছর ধরে ঢাকায় আয়োজন করা হচ্ছে জাতীয় পুষ্পমেলা। প্রতিবছরই বাড়ছে জাতীয় পুষ্পমেলার অবয়ব। এর মধ্যে দিয়ে বাড়ছে জনসাধারণের সচেতনতা। বৃদ্ধি পাচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে ফুল উৎপাদনের আগ্রহ উৎসাহ।

যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

ফুল সম্পর্কে সীমিত আকারে যে সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা, গবেষণা কাজ হয়েছে তার মধ্যে যা পাওয়া যায়, তা হলো–ঢাকা শহরে ফুলের বিপণন পদ্ধতি (হোসাইন ১৯৯৩) বাংলাদেশে ফুল রপ্তানির সমস্যা ও সম্ভাবনা (নন্দী ১৯৯৮) বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্পর্কিত আলোচনা (বাকী ১৯৯৯)। ফুলের অন্যান্য দিক যেমন ফুলের চাষ, রপ্তানি, মুনাফা ও বিপণন সমস্যা এবং সমস্যা নিরসনে কর্মনীতি অনুসন্ধানের উপর অধ্যয়ন সীমিত। এ শূন্যতা পূরণকল্পে এ নিবন্ধের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এটি ফুল ব্যবসায়ী, ফুলচাষি, ফুল বিপণনে বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, ফুল ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ফুল উৎপাদনকারী এবং ফুলের উপর অনুসন্ধিৎসুদের জন্য সহায়ক হবে।

এ প্রবন্ধে ফুল ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এর বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ গতিধারা অনুধাবনের প্রয়াস বর্তমান। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে: (১) ফুল ব্যবসায়ের পটভূমি, ফুলের চাষ ও ফুলচাষের প্রকারভেদ অনুসন্ধান; (২) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফুলের বাণিজ্য ও চট্টগ্রামে ফুল ব্যবসায়ের বিকাশ অবলোকন; (৩) ফুলের বিপণন ও ফুল ব্যবহারের বর্তমান প্রবণতা নিরীক্ষণ, এবং (৪) ফুল ব্যবসায়ের নানাবিধ সমস্যা ও এর প্রতিকার তথা উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

এ সমীক্ষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে গোটা বাংলাদেশের পরিবর্তে শুধু চট্টগ্রাম শহরকেই নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের ১৫টি থানার ৩০টি ফুলের দোকান, পাইকারী, খুচরা কারবারী, আড়তদার, উৎপাদনকারী এবং ৩০০ জন বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন পেশার ভোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সংগৃহীত তথ্যাবলির আলোকে প্রাপ্ত তথ্য (Findings) নিবন্ধিত হয়েছে। এতে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ ২০১১-এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। ফুল দোকানিদের জীবনবৃত্তান্ত সরাসরি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে ফুলসম্পর্কে ভোক্তার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুলের দোকানে বসে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যসমূহ বিভিন্ন প্রবন্ধ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি থেকে নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাবলি ব্যবহারে সাধারণ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

এ সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্থে পরিচালিত হওয়ায় এর সময় স্বল্প এবং পরিসর সীমিত হয়েছে। ফুল বিপণনের উপর পূর্বে উল্লেখ্যযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। সম্পূর্ণ নতুন একটি উদ্ভাবনী নান্দনিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কাজ করায় কৃচিৎ অনুসন্ধানকে সীমিত

করতে হয়েছে। নমুনা নির্বাচনে জটিলতা, উত্তরদাতার তথ্যপ্রদানে অনীহা, মাধ্যমিক তথ্যের অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

ফুল ব্যবসায়ের পটভূমি

ফুল পরিচর্যা সভ্যতার সমান বয়সী। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ ফুলের পরিচর্যা করত। নৃ-বিজ্ঞানীরা পাঁচ হাজার বছর আগের একটি মালার ফসিল আবিষ্কার করেছেন নেদারল্যান্ডসের সমাধি থেকে (বিশেষ প্রতিবেদন ২০০২)। তবে বাগ-বাগিচার প্রচলন হয় অনেক পরে। গোলাপ ফুল তার সৌন্দর্যের জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই পৌরাণিক কাহিনিতে ঠাঁই পেয়েছে। গ্রিক উপকথায় প্রেমের দেবী ভেনাসের পায়ের রক্ত থেকে গোলাপের জন্ম। আরব দেশীয় কাহিনিতে আছে, সাদা গোলাপকে বুলবুল পাখি আলিঙ্গন করতে গেলে কাঁটায় আহত হয়ে তার রক্তে সাদা গোলাপ থেকে লাল গোলাপ জন্মে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে পদ্মই শ্রেষ্ঠ ফুল বললে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে স্বর্গে নিয়ে সেখানে হাল্কা রঙের একটি সুগন্ধি গোলাপ দেখান। গোলাপ সম্বন্ধে এমন অনেক গল্প আছে। জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রাচীনতম গোলাপের বয়স ২ কোটি ৬০ লক্ষ বছর থেকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ বছর (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)। সম্ভবত আলাদাভাবে ফুলচাষের শুরু হয়েছিল উপাসনাকে কেন্দ্র করে। অনেকের মতে, শরীরসজ্জা ও গৃহসজ্জার জন্য সেকালের অভিজাত মানুষ সুন্দর ও পুষ্পবতী গাছ-লতা বন থেকে তুলে এনে রোপণ করতেন গৃহপ্রাঙ্গণে।

ইতিহাসবিদদের মতে, আর্যসভ্যতার সময় থেকে ফুলচাষ ও পরিচর্যার জন্য একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাদের বলা হতো ফুলমালী; আর যারা ফুলের মালা রচনা করত তাদের পরিচয় ছিল মালাকার (বিশেষ প্রতিবেদন ২০০২)। মধ্যযুগে রাজন্যবর্গ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দিষ্ট করে মালী ও মালাকার রাখতেন। তখনই বাগান শিল্পের মর্যাদা পেয়েছিল সারা দুনিয়ায়। সম্ভবত সবচেয়ে উন্নত বাগান পদ্ধতির উদ্ভাবক ইংল্যান্ড, রাশিয়া, চীন, মিশর, পারস্য ও ভারতের রাজা-বাদশাহরা। এক্ষেত্রে মোগলদের সুনাম বিশ্বব্যাপী। সেআমলে রচিত পুষ্পবাগিচা এখনও যে কারও নজর কাড়ে। এর মধ্যে কাশ্মীরের নিশাতবাগ সেই ঐতিহ্য ধারণ করে আছে আজও। ফুল বাগানের জন্য সুবিদিত ছিলেন লক্ষ্ণৌর নবাবগণ। যতদূর জানা যায়, উপমহাদেশে সুন্দর গোলাপ এসেছে প্রায় পাঁচশ বছর আগে বসরা থেকে। মোগলসম্রাট বাবর প্রথম 'বসরা' নামের এক গোলাপ নিয়ে এসেছিলেন। সুগন্ধি গোলাপি রঙের এ গোলাপ এখনও এদেশে 'বসরাই গোলাপ' নামে পরিচিত (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

বাংলাদেশে ফুল ব্যবসায়ের ইতিহাস বেশী দিনের নয়। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি হতে পঞ্চাশের দশকের দিকে ঢাকানগরীতে দুয়েকটি স্থানে ফুল, ফুলের মালা ও

ফুলের তোড়া বিক্রি হতো। তখন শিউলি ও গাঁদা ফুলের মালাই বেশি প্রচলিত ছিল (বিশেষ প্রতিবেদন ১৯৯১)। পঞ্চাশের দশকেও ফুলের কদর খুব একটা দেখা যেত না। তবে বড় বড় ঘরের বিয়ে-শাদি ও অন্যান্য উৎসবে, পূজা-পার্বণে ফুলের চাহিদা বেড়ে যেত। কিন্তু ফুল কেনার ব্যবস্থা তথা দোকান/ফেরিওয়ালা ছিল খুবই সীমিত। ফুলের প্রয়োজন হলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বাগান থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করা হতো। ঢাকায় প্রথম ফুলবিক্রির রেওয়াজ শুরু হয় ইসলামপুর ফাঁড়ির সামনে শাঁখারিপট্টি এলাকায় (কামাল ১৯৯৫)। কিছু ভবঘুরে লোক বিভিন্ন পার্ক থেকে ফুল সংগ্রহ করে এনে এখানে বিক্রি করত। এরপর ফুলের চাহিদা আস্তে-আস্তে বাড়তে থাকে। মুসলিম সমাজেও শুরু হয় মাজারকেন্দ্রিক ফুলচর্চা। ১৯৬২ সালে ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের মাজারকে কেন্দ্র করে তৎসংলগ্ন এলাকায় ফুলবিক্রি শুরু হয়। শুরু করেন এ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা বেকার যুবক হাকিম উল্লাহ (কামাল ১৯৯৫)। মাজারে আগত ভক্তরা এ সময় থেকেই মাজারে ফুল দেওয়ার রেওয়াজ চালু করেন। ষাটের দশকে বিভিন্ন সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের ফুলের মালা প্রদানের রেওয়াজ শুরু হয়।

স্বাধীনতার পরপরই ফুলের ব্যবহার ও গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। বিশেষ বিশেষ দিবস, যেমন–একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে ফুলের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ফুল ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ফুলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন বিকাশ লাভ করছে। ইসলামপুরে ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে 'গোলাপ বিতান' নামের একটি বিপণী বাণিজ্যিকভাবে ফুলবিক্রি শুরু করে। এর বছর দুয়েক পর শাহবাগ এলাকায় 'মালঞ্চ' ফুল বিক্রয় কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে শাহবাগ মোড়ে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ফুলের মার্কেট। এই মার্কেটে রয়েছে অনেকগুলো ফুলের বিপণি। এর মধ্যে 'মাধুকরী', 'সানফ্লাওয়ার', 'মাধবী' ও 'করবী' হলো পুরনো ফুলবিপণি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ বিপণিগুলোতে রয়েছে দৃষ্টিকাড়া নানান ফুলের সমাহার। এই মার্কেটের পাশেই ফুটপাতে প্রতিদিন ফুল নিয়ে বসে বেশ কয়েকজন দোকানি। ফুল ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, ঢাকা শহরে বিপণি ও ফুটপাত মিলিয়ে প্রায় দু'-আড়াইশ স্থানে নিয়মিত ফুল বিক্রি হয়। তবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই সংখ্যা বেড়ে তিন থেকে সাড়ে তিনশ'তে গিয়ে দাঁড়ায় (কামাল ১৯৯৫)। প্রতিটি ফুলের বিপণিতেই এখন গোলাপ এবং রজনীগন্ধা বেশি বিক্রি হয়। এছাড়া বেলী, কাঁটবেলি, গ্লাডিওলাস, গাঁদা, চায়নিজ বেলী, কাঠ-গোলাপসহ বিভিন্ন মৌসুমি ফুল বিক্রি হয়ে থাকে। মাঝে-মধ্যে অর্কিড, কার্নেশন, এস্টার, জারবেরা, টিউলিপ, লিলি, পদ্ম, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতিও বিক্রি হয় (পারমিতা ২০০২)।

বাংলাদেশের ফুলব্যবসা শুরু হয়েছিল আমদানির মাধ্যমে, যা এখন বেশ পরিণত। এখন দেশের নানাপ্রান্তে নানাজাতের দেশি-বিদেশি ফুলের চাষ হচ্ছে। লাভজনক প্রমাণিত হওয়ায় অনেক উদ্যমী যুবক ফুলচাষে জড়াচ্ছে। বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের তথ্য মতে, ফুলব্যবসায়ী ছাড়াও রাজধানী জুড়ে এখন ৮ থেকে ১০টি ফুল কোম্পানি গড়ে উঠেছে, যারা আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থল ও মঞ্চ ফুল দিয়ে ডেকোরেশনের কাজে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ফলে সমগ্র দেশে বিশেষ করে ঢাকাশহরে ফুলসংক্রান্ত ব্যবসায়ের পরিধি ধীরে-ধীরে বাড়ছে (মাহমুদ ২০১১)।

চট্টগ্রামে ফুল ব্যবসায়ের বিকাশ

চট্টগ্রামে ফুল ব্যবসায়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানা যায়, অধুনালুপ্ত লালদীঘির পাড়ের 'ডায়মন্ড নার্সারি'ই প্রথম ফুলের ব্যবসায় নামে। এরপরই আসে সোসাইটি নার্সারির নাম। রেলওয়ের চাকুরে মরহুম মোশাররফ হোসেন ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত কে. সি. দে রোডস্থ সোসাইটি ক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর ১৯৫০ সালে এখানকার চত্বরে নার্সারি গড়ে তোলেন। এরপর তিনি ফুল উৎপাদকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইন্টারফ্লোরা'র সদস্য হন (চৌধুরী ২০০১)। বর্তমানে সোসাইটি নার্সারি থেকে রকমারি ফুলের বীজ বিক্রি হয়। সোসাইটি নার্সারির পর মুরাদপুরের চিটাগাং নার্সারির নামটি উল্লেখ্যযোগ্য। এটি 'খুইল্ল্যা মিয়ার নার্সারি' নামে সমধিক পরিচিত এবং মালিক খুইল্ল্যা মিয়া মারা যাওয়ার পর এরও বিলুপ্তি ঘটে। চট্টগ্রামের প্রাচীন হিসাবে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ন্যাশনাল নার্সারির মালিক সুধাংশু বিমল শীল। তিনি প্রথমে পুরাতন গীর্জায় ব্যবসা শুরু করলেও পরে নন্দনকাননস্থ ডিসি হিলের পাদদেশে নার্সারি নিয়ে আসেন। বর্তমানেও এর ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং এখন ফুলের ব্যবসা করছে তার দু'সন্তান।

বর্তমানে ডিসি হিল বা এর আশেপাশে বহু নার্সারি বা ফুলবিক্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। নন্দনকাননস্থ ১নং গলির মুখে 'বাহাদুর' নার্সারি, এরই একটু পরে ডিসি হিলে উঠার রাস্তার সম্মুখে 'ডালিয়া' ফুল বিক্রয় কেন্দ্র এবং মোমিন রোডে 'বাংলাদেশ নার্সারি'র সামনেই রয়েছে 'রজনীগন্ধা'; আর ডিসি হিলের কোলে রয়েছে 'গার্ডেন ফ্লাওয়ার' নামে ফুল বিক্রয় কেন্দ্র। ইদানীং চেরাগি পাহাড়ের সম্মুখে বেশ কয়েকটি ফুল বিক্রয়কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। 'হেভেন ফ্লাওয়ার', 'স্টার পুষ্প বিতান,' 'অপরাজিতা', 'শাহ আব্দুল মজিদিয়া পুষ্প কেন্দ্র', 'চেরাগী ফ্লাওয়ার ভিউ' ইত্যাদি ফুল বিক্রয় কেন্দ্রগুলো এর মধ্যে অন্যতম। চট্টগ্রামের প্রায় সব জায়গাতেই এখন ফুলবিক্রয় কেন্দ্র ও নার্সারি গড়ে উঠেছে। টাইগারপাসে 'মডার্ন নার্সারি', লালখান বাজার মোড়ে 'পুষ্পকলি', 'পুষ্পনীড়', 'বনলতা', 'ফ্লাওয়ার হাউজ'; ওয়াসার মোড়ে জমিয়াতুলফালাহ সংলগ্ন 'আরণ্যক', এম. এম. আলী সড়কের মুখে 'ফ্লাওয়ার ল্যান্ড',

কাজির দেউড়ির অ্যাপোলো শপিং কমপ্লেক্সে 'মালঞ্চ', কল্লোল সুপার মার্কেটে 'কাননপুর', 'মাধব', প্রবর্তক মোড়ে 'নন্দন', 'রূপসা', 'মহুয়া', গোলপাহাড়ের মোড়ে 'কনকচাঁপা', চকবাজারে 'পুষ্পমঞ্চ', 'পুষ্পমেলা', 'মাধুকরী', 'সবুজ বিপ্লব', কাতালগঞ্জে 'বনফুল', হালিশহরে 'পুষ্প মালঞ্চ' ইত্যাদি ফুল বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া নিউমার্কেটের একতলায় 'মৌসুমী', নিউমার্কেটের মোড়ে 'নিউ মার্কেট ফুলের দোকান', 'সিটি ফ্লাওয়ার কর্নার', নালাপাড়ায় 'নিউ রূপসা', আগ্রাবাদে 'মায়ের দোয়া', 'গাউসিয়া', 'হাসনাহেনা', 'করবী', চৌমুহনীতে 'কর্ণফুলী', 'প্রভাতী', লালদীঘির পাড়ে 'পুষ্পবিতান' ছাড়াও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকার ফুটপাতে ফুলের ব্যবসায় জমজমাট। এমনকি শহরের অনেক পাড়ায় স্টেশনারি দোকানগুলোতেও এখন রজনীগন্ধা, গোলাপ, বেলী ফুলের মালা বিক্রি হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ফুল ও ফুলের মালা হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। এমনিভাবেই গত দশ বছরে প্রায় পুরো চট্টগ্রাম শহরে ফুলের ব্যবসায় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। ফুল ব্যবসায়ী সমিতির দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে চট্টগ্রামে ৩৭০টির মতো ফুল বিক্রির দোকান রয়েছে।

চট্টগ্রাম শহরে ফুল পছন্দের ক্ষেত্রে চাহিদার ক্ষেত্রে রজনীগন্ধা ও গোলাপ-ই অধিক প্রিয়। এছাড়া ভিন্ন রুচির কিছু ক্রেতার মধ্যে অন্যান্য ফুলের কদর রয়েছে। রজনীগন্ধা খুব সুগন্ধি মনোরম ফুল বলেই চট্টগ্রাম শহরের মানুষ একে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। এ ফুল রাতের বেলায় সুগন্ধ ছড়ায়। এজন্যে এর নাম রজনীগন্ধা। দণ্ডের নীচের ফুলগুলো প্রথমে ফুটতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে উপরের কুঁড়ির পাপড়ি ফোটে। রজনীগন্ধার আসল দেশ মেক্সিকো (রিফেল-২০০০)। রজনীগন্ধা বহুদিন পর্যন্ত টাটকা থাকে। এ ফুলের চাষ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হলেও সবচেয়ে বেশি হয় যশোহর এলাকায়। বাংলাদেশে বর্তমানে সারাবছরই রজনীগন্ধা পাওয়া যায়। ফুলের চাষি বা ফুল ব্যবসায়ীরা যেমন চট্টগ্রামের দোকানগুলোতে রজনীগন্ধা দিয়ে যায়, তেমনি দোকানগুলোর মালিকেরাও যশোহর গিয়ে ফুল ক্রয় করে থাকেন। বর্ষাকালে রজনীগন্ধার দাম খুব কম এবং শীতকালে খুবই বেশি হয়। ফুলের মধ্যে বর্ণ, গন্ধ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে গোলাপই শ্রেষ্ঠ। তাইতো গোলাপকে 'ফুলের রানি' নামে ডাকা হয়। গোলাপের আসল দেশ ইরান। বাংলাদেশের সর্বত্রই গোলাপ পাওয়া যায় এবং বাণিজ্যিকভাবে চট্টগ্রাম নার্সারিতে গোলাপ চাষ করা হয়। গোলাপ ফুল ঢাকার সাভার অঞ্চলে খুব বেশি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে গোলাপের ঋতু শীতকাল; তবে অনেক গাছে সারাবছরই ফুল ফোটে। সাদা, হলুদ, গোলাপি, লাল, কালচে লাল ও বেগুনি আভাযুক্ত নানা ধরনের গোলাপ জন্মায় আমাদের দেশে। তবে কালচে লাল রঙের যে গোলাপ বা 'ব্লাক প্রিন্স' রয়েছে– সেটি বাংলাদেশে দুর্লভ।

চট্টগ্রামের ক্রেতাদের কাছে সাধারণত বেলী ও রজনীগন্ধার মালাই অধিক প্রিয়। এছাড়া রয়েছে গোলাপ ফুলের মালা, গাঁদা ফুলের মালা, শিউলি ফুলের মালা

ইত্যাদি। বেলী ফুল আসে নারায়ণগঞ্জ ও সাভারের নার্সারিগুলো থেকে। গাঁদা ফুলের মালা সাধারণত গায়ে হলুদ, বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। গাঁদাফুল নানা জাতের হয়, যেমন–ছোট, বড়, হলুদ, কমলা রঙের। তাই ছোট ও বড় এবং মান ও রং অনুযায়ী গাঁদা ফুলের মালার দামেরও তারতম্য হয়।

ফুল বিপণনের গুরুত্ব

বাংলাদেশের ফুল ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখের দাবি রাখে। কেননা ক্রমবর্ধমান এই ব্যবসাটি কর্মসংস্থান ও সঞ্চয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। ফুলের বাজারজাতকরণ বহুবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ফুল শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দামি সুগন্ধি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ প্রভৃতি তৈরিতে ফুলের ব্যবহারের জুড়ি নেই। তাছাড়া ফুল মধু সংগ্রহের অন্যতম উৎস। প্রাচীনকাল থেকেই গোলাপ বহুল ব্যবহৃত ফুল। ইতিহাসখ্যাত রাজা-রানিদের কাছে গোলাপ সর্বদাই আদৃত হয়েছে। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এদেশে গোলাপপানির বা গোলাপজলের ব্যবহার করা হয়। মোগল সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের আবিষ্কৃত 'আতর-ই-জাহাঙ্গির' থেকে গোলাপের আতর প্রচলিত হয়। গোলাপ দিয়ে জেলি, মিষ্টি, হালুয়া ইত্যাদি খাদ্য-সামগ্রী ও সুগন্ধি তৈরি করা যায়। ভেষজ হিসেবেও গোলাপ গাছ ব্যবহৃত হয়। গোলাপের ফল ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে গোলাপের উৎপাদন ও বিপণন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সালনা ও সাভারের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপকভাবে এখন গোলাপের চাষ হচ্ছে (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

গৃহসজ্জায়ও ফুল ব্যবহৃত হয়। মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। টেবিলের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখতে কে না ভালোবাসে? মানুষ এখন নিজের শোবার ঘরে আত্মিক তৃপ্তির জন্য ফুল রাখে। অতিথিদের কাছে ড্রয়িং রুমটিকে আরো আকর্ষণীয় করার মনোবাসনায় ফুলদানিতে স্থান দেয় রজনীগন্ধা, গোলাপ, গ্লাডিওলাস ইত্যাদি হরেক রকমের ফুল। খাওয়ার সময় ডাইনিং টেবিলেও বিভিন্ন পদের ও স্বাদের খাবারের পাশাপাশি নানান বর্ণের ও গন্ধের বাহারি ফুল রাখা হয়।

উপহার হিসেবেও ফুলের ব্যাপক কদর রয়েছে। খাদ্য পেটের ক্ষুধা মেটায় আর ফুল মেটায় চোখ আর মনের ক্ষুধা। এখন মানুষ হৃদয়ের কাছের ও দূরের সব মানুষকেই ফুল উপহার দিতে ভালোবাসে। জন্মদিনে, মৃত্যুবার্ষিকীতে, বিয়ের অনুষ্ঠানে কনেকে পুষ্পবৃষ্টিতে বরণ, বাসরঘরের বিছানাতে, মেঝেতে, দেয়ালে সর্বত্রই ফুলের বর্ণিল অস্তিত্ব। তাছাড়া বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার বার্ষিক অনুষ্ঠানে অতিথিকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যও ফুল ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যায়, অফিস থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত ফুলের ব্যবহার বিস্তৃত। বিদেশিদের ফুল দিয়ে বরণ করা তো রীতিমত রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে।

ফুলের আরো বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। ফুল আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অনেকেই শুধু আত্মতৃপ্তির জন্যে প্রায়শই ফুল ক্রয় করে থাকেন। রমণীগণ নিজেদের খোঁপায় ফুল পরে সাজার জন্য ফুল ক্রয় করেন। অনেকে অফিস থেকে ফেরার পথে ফুল ক্রয় করেন প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য। আজকাল অনেকেই প্রিয়জনদের কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিদেহী আত্মাদের স্মরণ করবার জন্য। ইদানীং হাসপাতালে রোগী দেখতে যাওয়ার সময়ও অনেকে ফুলের তোড়া ও ফুল নিয়ে যান। আগের প্রচলিত রেওয়াজ অর্থাৎ রোগী দেখতে হরলিক্স বা ফলের পরিবর্তে এখন ফুলের কদর বেড়েছে। তাছাড়া আজকাল টিভিতে প্রচারিত প্রায় অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপনেই ফুলকে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। মাজার-মন্দিরেও ফুলের ব্যবহারের জুড়ি নেই।

ফুলের চাষ

পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ বা সকল ফসল একটি নির্দিষ্ট স্থানে হয় না। কোনো দেশে কোনো কোনো উদ্ভিদ ভালোভাবে জন্মাতে পারে, আবার অন্যগুলো অন্যদেশে ভালোভাবে জন্মে। অর্থাৎ প্রতিটি উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন হয় আলাদা আলাদা ভৌগোলিক পরিবেশ। এ পরিবেশের মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, আলো, বাতাস, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, তুষার, বায়ুপ্রবাহ, মাটি ইত্যাদি। আমাদের দেশে যে জলবায়ু বিদ্যমান তাতে স্থানীয় ফুলগুলো ভালোভাবেই জন্মে থাকে এবং এ দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমির মাটি ফুলের জন্য উপযোগী (নন্দী ১৯৯৮)। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করার জন্য সব ফুল চাষের আওতায় আনা হচ্ছে না। সাধারণত বাজারে কাট ফ্লাওয়ার (কাটা ফুল) হিসেবে এবং মালা তৈরির জন্য যে সমস্ত ফুলের চাহিদা রয়েছে শুধু সেগুলোকেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের আওতায় আনা হয়েছে। বাজারে, দোকানে সচরাচর যে ফুলগুলো দেখা যায় সেগুলো হলো–গোলাপ, বেলী, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা ও গ্লাডিওলাস। তাছাড়া ফুলের বিভিন্ন আইটেম তৈরির জন্য টুইগ হিসেবে কতগুলো উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। সেগুলো হচ্ছে ঘাসফুল, দূর্বা, পানপাতা, ঝাউপাতা ও কামিনী পাতা। ফুলচাষের জন্য যদিও আমাদের দেশে আলাদাভাবে কোনো জমি রাখা হয় না কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার জন্য অন্যান্য ফসলের মতোই ঐ সব ফুলের উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত বসতবাড়ির আশেপাশের পতিত উঁচু জায়গা ফুল চাষের জন্য নির্বাচন করা হতো। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে এখন ফুল চাষের জন্য উপযুক্ত খোলা মাঠ বাছাই করা হচ্ছে। ফুল চাষের জন্য উঁচু, বন্যামুক্ত, সূর্যালোকপূর্ণ দো–আঁশ বা বেলে দো–আঁশ মাটি দরকার। অন্যদিকে ফুল যেহেতু একটি পচনশীল বস্তু, সেহেতু এর দ্রুত পরিবহনের জন্য পরিবহন ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এদিক দিয়ে লক্ষ করলে বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গার সঙ্গেই আজ

যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং তা দিনকে-দিন উন্নত হচ্ছে। সুতরাং ফুল উৎপাদনকারী চাষিদের জন্য এটা একটা ভালো সুযোগ।

ফুলচাষ এখন উদ্ভিদবিদ্যার শাখা এবং উচ্চতর গবেষণার বিষয়। উষ্ণ মরুতেও ফুলচাষ হচ্ছে এবং পুষ্পশোভিত হচ্ছে বালুকা প্রান্তর। বলাবাহুল্য আজকাল বাংলাদেশে ফুলচাষ হচ্ছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে ফুলচাষ শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালের দিকে। তবে ফুলক্ষেত বলতে যা বোঝায় তার সূচনা ১৯৮৪ সালে যশোহরের ঝিকরগাছায়। পরে ফুলচাষ বিস্তৃত হয় যশোহরের সদর, শার্শা ও চৌগাছা উপজেলায় এবং কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও সাতক্ষীরা জেলায়। জানা যায়, ঝিকরগাছা থানার পার্শ্ববর্তী এলাকা গদখালি, পানিসারা, টাউরা, নীলকণ্ঠ নগর, বর্ণি, চাঁপাতলা, শিওরদহ, ফুলিয়া, কলাগাছি, হাড়িয়া, বাইশা, চাঁদপুর, মানিকখালি ও নাভারণ এবং ঝিনাইদহের মহেশপুর এলাকায় ফুল চাষ হয়। বেশি হয় রজনীগন্ধা ও গাঁদা। ১৯৯৮ সালে ঝিকরগাছায় রজনীগন্ধার চাষ হতো দু'হাজার একর জমিতে, বর্তমানে ঝিকরগাছা ও শার্শা থানার ছয় ইউনিয়নের ৯০টি গ্রামে ফুলের চাষ হচ্ছে। প্রায় চার হাজার বিঘা জমিতে উৎপাদিত হচ্ছে কয়েক কোটি টাকার ফুল (বিশেষ প্রতিবেদন ২০০২)। এসব এলাকায় রজনীগন্ধা ও গাঁদার পাশাপাশি বাড়ছে গোলাপ ও গ্লাডিওলাসের চাষ। যশোহরে রজনীগন্ধা ও গাঁদা ছাড়াও শুরু হয়েছে কালার গ্লাডিওলাস এবং খয়েরি গাঁদার উৎপাদন।

বাংলাদেশে ফুল চাষের দিক থেকে যশোহর ও ঝিনাইদহ সবচেয়ে অগ্রগামী। দেশের মোট ফুল চাষের সিংহভাগই এ দুটি জেলায় হয়ে থাকে। ফুলের বাজার হিসেবে শীর্ষে থাকা যশোহরের ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলার ৬৫টি গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ হচ্ছে। এসব ফুলের মধ্যে রয়েছে–গোলাপ, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, জারবেরা, গাঁদা ও জিপসি (মাহমুদ ২০১১)। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, দোলনচাঁপা, জিপসি, স্নোবাল, এস্টার ফুলের চাষ হচ্ছে সাভারের আবদুল্লাপুর, ধামরাই, নবীনগর ও রাজসন এবং মিরপুরের নওয়াবের বাগ এলাকায়। জয়দেবপুরের কাশিমপুর বিএডিসি ফার্মেও প্রচুর রজনীগন্ধা ও গ্লাডিওলাস উৎপন্ন হতে দেখা যায়। নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া, বন্দর এবং হাফদিতে উৎপন্ন হয় বেলী, চায়না বেলী ও শীতের গাঁদাফুল। দেশের ভিতর চাষের প্রধান অঞ্চল হচ্ছে এগুলো। তবে দেশের সব শহরের নার্সারিতে এবং আশেপাশের শহরতলিতে গোলাপ, গ্লাডিওলাস, গাঁদাসহ আরো রং-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হয়। কালিয়াকৈর এবং নরসিংদীতে নিয়মিত চাষ হয় কামিনী এবং বাহারি গাছ ঝাউ ও পাম। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে ঘাসফুল, দূর্বা–এসবও আসে। এগুলো ফুলের তোড়া, বাস্কেট ও বিভিন্ন রকম ফুলের আইটেম তৈরিতে টুইগ বা সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামের হাটহাজারি, চকোরিয়া ও মিরেরসরাইতে বেশ কয়েকটি গোলাপের বাগান

গড়ে উঠেছে। তাছাড়া এসব থানায় বেশ কিছু কৃষক গাঁদা ফুলের চাষও করে থাকে। বাংলাদেশে এখন প্রায় ৪০ রকমের ফুল চাষ হচ্ছে। সাধারণ কৃষক ছাড়াও ফুলচাষে এগিয়ে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী যুবকেরা।

একুশ শতকের অত্যাধুনিক যুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন বিষয়ে এবং খাতে ব্যাংকের ঋণপ্রদান করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক ফুলচাষের জন্য চালু করেছে 'ফুল চাষে ঋণপ্রদান'। ফুলচাষ যেহেতু একটি লাভজনক ব্যবসা, সেহেতু এ খাতে অর্থায়ন করা কৃষি ব্যাংকের একটি যুগান্তকারী ও আধুনিক চিন্তাধারা। এখন ফুলের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই ফুলের উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে করার প্রবণতাও বাড়ছে। আমাদের দেশে রজনীগন্ধা, গোলাপ, ক্যালেরিয়া এবং গাঁদা প্রভৃতি ফুলচাষ বৃদ্ধিতে কৃষিব্যাংক অর্থায়ন করতে শুরু করেছে। স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর পর ফুল রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক ১৩/৫/২০০১ তারিখে ফুল চাষে অর্থায়নের বিষয়ে নীতিমালা জারি করেছে। ফুলের নির্যাস হতে আতর, গোলাপ, খোশবু ও সুগন্ধি তৈরি ফুলের আরেকটি আকর্ষণীয় দিক এবং এ ক্ষেত্রেও কৃষিব্যাংক সহায়তা দেবে বলে জানা যায় (মুরাদ, ২০০১)।

নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশে কৃষিব্যাংক হতে প্রকৃত ফুলচাষি অথবা ফুলচাষে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি ফুল চাষের অনুমোদিত এলাকার শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। যশোহর অঞ্চলের ঝিকরগাছা, নাভারণ, শার্শা, লক্ষ্মণপুর, কায়েসখোলা, যশোহর ও চৌগাছা শাখা, সাতক্ষীরা অঞ্চলের খোরদো বাজার, কলারোয়া, বালিয়াডাঙ্গা বাজার ও সোনাবাড়িয়া শাখা, ঝিনাইদহ অঞ্চলের সিঙ্গিবাজার, কোট চাঁদপুর, মহেশপুর, বালিয়াডাঙ্গা ও কালীগঞ্জ শাখাগুলো ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে ঋণের আবেদন ও যথাযথ মূল্যায়ন শেষে ঋণ বিতরণ করে আসছে। বর্তমানে উক্ত তিন জেলার ১৬টি শাখা ফুলচাষে ঋণ নিয়মিত বিতরণ করছে (মুরাদ ২০০১)। সুদের হার শস্যঋণের ন্যায় ১৩%, যা সবসময় সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। শস্যঋণের ন্যায় প্রচলিত নিয়মাচার পালন করে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করতে পারেন। ৫০,০০০ টাকার উর্ধ্বে ঋণ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মঞ্জুর করতে পারেন। শস্যঋণের ব্যতিক্রম হিসেবে ন্যূনতম ৫ শতক জমির জন্য ফুলচাষে ঋণপ্রদান করা হয় এবং বর্গাচাষিগণও এ ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। রজনীগন্ধা ফুলচাষের জন্য বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা, ক্যালেরিয়া চাষের জন্য বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা, গাঁদাফুল চাষের জন্য বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ১৭,০০০ টাকা এবং গোলাপ চাষের জন্য বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ৩৭,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

ঋণ পরিশোধ করার জন্য ৬ মাস হতে ১৮ মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়ে থাকে, যা

ফুল উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারে বিক্রি করা পর্যন্ত যথাযথ সময় বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য ফুল চাষের জন্য ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি দেশের যে কোনো এলাকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যে কোনো শাখায় যোগাযোগ করতে পারেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং আর্থিক সহায়তা গ্রহণের নিমিত্তে শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ–১ এর সঙ্গে যোগাযোগ করে যথাযথ পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন এবং যুবক-যুবতীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করার লক্ষ্যে ফুলচাষে ঋণপ্রদান দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে ফুল চাষের প্রকারভেদ

বাংলাদেশের জলবায়ু ফুল চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে শীতকালে বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এখনও শৌখিন ও পেশাদার–উভয় ধরনের ফুল চাষই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখানে কাটাফুল প্রধানত গোলাপ, রজনীগন্ধা, অর্কিড ও গ্লাডিওলাস, বাহারি পাতার গাছ ও মৌসুমি ফুলের বীজের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে সীমিত পরিমাণ গোলাপ ও রজনীগন্ধা রপ্তানি হচ্ছে। দেশি ও বিদেশি বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত নার্সারি গড়ে উঠছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরই দেশে কাটাফুলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ও আমদানিকৃত ফুল দিয়েই এখানে এই ব্যবসায়ের শুরু। রাজধানী ও অন্যান্য শহরে ফুলের চাহিদা মিটানোর জন্য কিছু কিছু চাষি বাণিজ্যিকভিত্তিতে ফুলচাষ আরম্ভ করেন। ফুলের বাণিজ্যিক চাষাবাদে সহায়তা যোগানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি পুষ্পচর্চা গবেষণা কেন্দ্র চালু করেছে। বাজারে নিয়মিত বিক্রেয় স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন ফুলের মধ্যে রয়েছে কয়েক জাতের গোলাপ, গ্লাডিওলাস, হলুদ, কমলা ও লাল রঙের গাঁদা, কয়েক জাতের চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা ও জলপদ্ম। এছাড়া স্থানীয়ভাবে পরিচিত করবী, জুঁই, কামিনী, শাপলা, দোলনচাঁপা, ডালিয়া এবং জিনিয়া ফুলও মাঝে-মধ্যে পাওয়া যায় (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

অনুকূল ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর সুবাদে বাংলাদেশ একটি উদ্ভিদসমৃদ্ধ অঞ্চল। অধিকন্তু হিমালয়, বার্মা-মালয় ও পূর্বভারতের উদ্ভিদ জগতের মিলনস্থল বিধায় এখানে প্রজাতির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অধিক। যুগযুগ ধরে এমন সমৃদ্ধ প্রকৃতির মাঝখানে বসবাসরত বাংলার মানুষ স্বভাবতই উদ্ভিদঘনিষ্ঠ ও পুষ্পপ্রেমিক, আর সেই সাক্ষ্য আছে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে। লোকগাঁথা ও লোকগীতিতে, এমনকি তাম্রলিপিতেও। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে পূজার্চনার জন্য ফুলের যোগান দিতে নিশ্চিতই বাগান ছিল গৃহাঙ্গন ও মন্দিরে, ধ্যানার্থীর তপোবনে এবং সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য রাজন্য

ও অভিজাতদের প্রাসাদে। এসব ফুলের সবই আজ দেশজ ও বনজ। আজও আমাদের পাহাড় ও বনাঞ্চলে অনেক প্রজাতির ফুল আছে যেগুলো বাগানে লাগানো যায়। তবে মোগল সম্রাটেরাই ভারতে প্রথম সংগঠিত ও নির্দিষ্ট নকশার উদ্যানরীতি প্রবর্তন করেন। তাঁরাই এদেশে আনেন মধ্যপ্রাচ্যের গাছপালা, চীনের গোলাপ, লিলি ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক শাসনামলে পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন হওয়ায় এদেশে মোগলশৈলীর উদ্যানের কোনো বিবর্তন আর ঘটেনি। আজও ভারতীয় উদ্যান বলতে মোগল উদ্যানই বোঝায়। এদেশের বাগানের গাছপালার সিংহভাগই বিদেশি। এগুলো এনেছেন রাজা-বাদশা, পরিব্রাজক, বণিক, ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের কর্মচারীরা। বাংলাদেশের বাগানের ফুলগুলোর মধ্যে ভারত, মায়ানমার ও মালয় ছাড়াও আছে চীন, জাপান, আফ্রিকা ও ক্রান্তীয় আমেরিকার বহু প্রজাতি। পরিচিতির সুবিধার্থে এগুলোকে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, কন্দমূলীয় ও মৌসুমি ঔষধিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

বৃক্ষ: পুষ্পবৃক্ষ সাধারণত লাগানো হয় পার্ক, বড় বাগান, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের চত্বরে। সুশ্রী পাতা, রঙিন প্রস্ফুটন ও মধুর গন্ধের জন্য এগুলো আকর্ষণীয়। উল্লেখ্যযোগ্য বৃক্ষ–শিরীষ, ছাতিম, কদম, দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন, শিমুল, পলাশ, বটলব্রাস, সোনালু, সোনাইল/কর্ণিকার, লাল সোনাইল, সিনজিরি, নাগলিঙ্গম, বরুণ, কৃষ্ণচূড়া, গ্লিরিসিডিয়া, কুরচি, কুটজ, গিরিমল্লিকা, জারুল, বিলাতি জারুল, হিমচাঁপা/উদয়পদ্ম, নাগেশ্বর, বকুল, শেফালি, পেল্টোফরাম, কাঁঠগোলাপ, গৌরচাঁপা, গোলকচাঁপা, গোলাচি, অশোক, কলকে ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক বাগানে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত কিছু দুষ্প্রাপ্য প্রজাতি–পুন্নাগ/সুলতান চাঁপা, স্কারলেট, কর্ডিয়া, গুস্তাভিয়া, পলকজুঁই, জ্যাকারান্ডা, মিলেসিয়া, আকাশনীম/হিমঝুরি, কনকচাঁপা, রামধনচাঁপা, রুদ্রপলাশ, পরশপিপুল ইত্যাদি (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

গুল্ম: এগুলো গোড়া থেকে শাখায়িত; সাধারণত চিরসবুজ ও বর্ষজীবী, ছোটবড় সব ধরনের বাগানেই লাগানো হয়। বাগান সজ্জার এই প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে আছে শিবঝুল/শিবজটা, ঘণ্টাফুল, ঝিণ্টি কুরুবক, স্বর্ণঝিণ্টি, কাঞ্চন, রাঁধাচূড়া, হাস্‌নাহেনা, ধুতরা, লালপাতা, পাতাবাহার, গন্ধরাজ, জবা, স্থলপদ্ম, লাল রঙ্গন, হলুদ রঙ্গন, গোলাপি রঙ্গন, সিঙ্গাপুরী রঙ্গন, কুন্দ, বেলী, ফুরুস, গুয়েগাঁদা, লঙ্কাজবা, সন্ধ্যামালতী/সন্ধ্যামণি, কামিনী, নাগবল্লী, রক্তকরবী, গোলাপ, টগর, নয়নতারা অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য গুল্মের মধ্যে রয়েছে: লাল ঘণ্টাফুল, ছোট ঘণ্টাফুল, ব্রুনফেলসিয়া, কেলিস্টেমন, রাজঘণ্টা, ডম্বিয়া, ঝুমকোজবা, নীলজবা, স্বর্ণচামেলি, জেট্রফা, জহুরিচাঁপা, দাঁতরাঙ্গা/লুটকি, অঞ্জল, নীলচিতা, রন্ডেলেসিয়া, রাসেলিয়া, সোনাপাতি, নীলঘণ্টা ইত্যাদি (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

লতা: এগুলোর অধিকাংশই বহুবর্ষজীবী, কাণ্ড দুর্বল বিধায় নিজেই কিংবা আঁকশি,

কাটা ইত্যাদি উপাঙ্গের সাহায্যে কোনো আশ্রয় জড়িয়ে উপরে উঠে। এগুলো মাটিতে তেমন জায়গা দখল করে না বলে ছোট বাগানেও বেশি সংখ্যায় লাগানো যায়; দালান, ফটক, বেড়া ইত্যাদিতে লতা বহুল ব্যবহৃত হয়। এগুলোর অনেক প্রজাতি রঙিন ফুল ও অন্যগুলি সুগন্ধি প্রস্ফুটনের জন্য আকর্ষণীয়। লতানো গোলাপ ও বাগান বিলাসের জন্য এদের বিশেষ সমাদর। বাগানের সাধারণ লতার মধ্যে আছে– মালতি লতা, হলুদ ঘণ্টাফুল/হরকাকরা, অনন্তলতা, কাঁঠালিচাঁপা, বাগানবিলাস, ট্রাম্পেট ক্লাইম্বার, ব্লিডিং, হাট, অপরাজিতা, উলটচণ্ডাল, ভাদ্রা, মাধবীলতা, চন্দ্রমুখী, দুধিয়ালতা, রেললতা, মর্নিংগ্লোরি, জুঁই, চামেলি, যূথিকা, হ্যানিস্যাকল, ঝুমকোলতা, নীলমণি লতা, লতাপারুল, গোল্ডেন শাওয়ার, তারামণি লতা, কুঞ্জলতা, মধুমালতী/মধুমঞ্জরী লতা প্রভৃতি।

কন্দজঃ এগুলো সাধারণত বহুবর্ষজীবী; সচরাচর শীতে মরে যায় এবং বসন্ত-গ্রীষ্মে আবার গজায়। কোনো কোনোটির ফুল খুবই আকর্ষণীয়, কোনোটি বা সুগন্ধি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–বেলেডনা লিলি, গ্লাডিওলাস, ফায়ারবল লিলি, দোলনচাঁপা, স্পাইডারলিলি, ভূঁইচাঁপা, রজনীগন্ধা ও ঘাসফুল (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

মৌসুমি ফুলঃ এগুলো সাধারণত শীতের শুরুতে চাষ করা হয়। কোনো কোনোটি বর্ষায়ও। শীতের বিবর্ণ প্রকৃতিতে নানা রং ছড়ায় বলে এগুলোর বিশেষ সমাদর। অধিকাংশই বিদেশি। এগুলোর মধ্যে আছে–অ্যাজিরাটাম, হলিহক, অ্যান্টারিনাম, ক্যালান্ডুলা, অ্যাস্টার, মোরগফুল, করন ফ্লাওয়ার, সুইট সুলতান, চন্দ্রমল্লিকা, ক্যারিওপসিস, কসমস, বর্ষাতি কসমস, ডালিয়া, লার্কস্পার, সুইট উইলিয়াম, কার্নেসন, পিংক, গ্যালার্ডিয়া, সূর্যমুখী, বোতামফুল, স্ট্র ফ্লাওয়ার, দোপাটি, মর্নিংগ্লোরি, সুইট পি, লবেলিয়া, লুপিন, পপি, পেটুনিয়া, ফ্লকস, পর্তুলেকা, স্যালভিয়া, গাঁদা, কালী গঁদ্দা, ন্যাস্টারসিয়াম, ভার্বেনা, পেনসি, জিনিয়া প্রভৃতি (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

বাংলাদেশের মোট ফুলের সিংহভাগই চাষ হয় যশোহর ও ঝিনাইদহ জেলায়। এখানকার ফুলের চালান ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট সহ দেশের ৫৪টি জেলায় যায়। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গদখালির (যশোহর) পাইকারি বাজারে ৫ থেকে ৮ লাখ টাকার ফুল বিক্রি হয়। ফুলচাষি সমিতির দেয়া তথ্যমতে, বর্তমানে এলাকার ৪ হাজার ৫০০ কৃষক ১ হাজার হেক্টর জমিতে ফুল চাষ করছেন। এর সঙ্গে জড়িত ৪ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা। এখন বছরে যশোহরের ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলায় ১০০ কোটি টাকার ফুল উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকার মাঠ থেকে প্রতিদিন ৫ হাজার গোছা ফুল রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রির জন্য আসে। তবে যশোহর ও ঝিনাইদহের

পাশাপাশি এখন মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ও বগুড়াও ফ্লাওয়ার জোন হিসেবে গড়ে উঠেছে। ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহে ৩ হাজার বিঘা জমিতে নানা জাতের ফুল চাষ হচ্ছে। জেলা সদর, মহেশপুর ও কালীগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি গ্রামে ব্যাপকহারে ফুল চাষ হচ্ছে। ২০০৮ সাল থেকে এসব এলাকায় জারবেরা ফুল আর ২০০৯ সাল থেকে লিলিয়াম ফুলের চাষ শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাঙ্গালোরের টিস্যু কালচারের মাধ্যমে জারবেরার চাষ করা হচ্ছে। টাঙ্গাইলের বেশ কয়েকটি স্থানে দেশি ফুলের চাষ হচ্ছে (মাহমুদ ২০১১)।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চট্টগ্রামেও ফুল চাষের আগ্রহ দেখা যায়। ১৯৯১ সালে চট্টগ্রামের চকোরিয়ার বরইতলি গ্রামে ৪০ শতক জমিতে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। ২০০১ সালে তিন একর জমিতে গোলাপের চাষ করা হয়। বর্তমানে বরইতলির ১০০ একর জমিতে গোলাপের চাষ হচ্ছে (কুদ্দুস ২০১১)। কক্সবাজার–চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্বপাশে পাহাড়ি এলাকায় গোলাপ বাগান রয়েছে ৩০টি। পশ্চিমপাশে ফসলি জমিতে রয়েছে ২০টি। অন্যগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গ্রামে। মেরেন্ডা (লাল), রাম্বার (হলুদ), জরিনা সুন্দরী (রোদে রং পরিবর্তিত হয়), লিংকন (গাঢ় লাল) গোলাপ চাষ হয় এখানকার বাগানগুলোতে। গোলাপ বাগান মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, সারাবছর চাহিদা থাকে গোলাপের এবং চাষও হয় বছরজুড়ে। তবে শীত মৌসুমে ডিসেম্বর–এপ্রিলে গোলাপের চাহিদা থাকে বেশি। কারণ এসময়ে বিয়ে, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ, ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে সহ বিভিন্ন উৎসব থাকে। বাগান মালিকদের কাছ থেকে জানা যায়, বাগানের ৮০ শতাংশ গোলাপ সরবরাহ করা হয় চট্টগ্রাম শহরের চেরাগি পাহাড়ের দোকানে। অবশিষ্ট গোলাপ যায় কক্সবাজার শহরে।

গোলাপ ছাড়াও চট্টগ্রামের দোহাজারি, চকোরিয়ার বরইতলিতে বোতামফুল ও অর্কিডের চাষ হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় অর্কিডের সরবরাহ অনেক কম। অর্কিডের গণ ও প্রজাতির সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৭০০ ও ২০,০০০; শীতলতম অঞ্চল ছাড়া গোটা বিশ্বে বিস্তৃত, আর্দ্র-ক্রান্তীয় এলাকায়ই অধিক পাওয়া যায়। অর্কিড বহুবর্ষজীবী ঔষধি, পরাশ্রয়ী বা ভূমিজ, কখনও শিলা উদ্ভিদ বা মৃতজীবী; পরাশ্রয়ী সদস্যরা প্রধানত ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের এবং ভূমিজ প্রজাতিগুলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বাসিন্দা। বর্ণাঢ্য পুষ্পপুটসহ বাঁকানো গড়ন অর্কিড ফুলের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে প্রায় ২০০ প্রজাতির অর্কিড জন্মে। সারাবছর কিছু কিছু অর্কিডের ফুল ফুটলেও জানুয়ারি–জুন হলো ফুল ফোটার সময় এবং সর্বাধিক ফোটে মার্চ–এপ্রিলে। ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক বিবেচ্য অর্কিড। কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী বিদেশি অর্কিডের সঙ্গে দেশি অর্কিড সংগ্রহ ও বিপণনে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। অর্কিডের স্বাভাবিক বাসস্থানের গাছপালার অবাধ ধ্বংস ও অতিমাত্রায় অর্কিড সংগ্রহের জন্য

কিছু পরাশ্রয়ী অর্কিড ইতোমধ্যে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় অর্কিডের জার্মপ্লাজমের বৃহত্তম সংগ্রহ রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্কিডশালায় (বাংলাপিডিয়া ২০০৩)।

ফুলের মূল্য নির্ধারণপদ্ধতি

চট্টগ্রামের ফুলের দোকানগুলো নিজেরা কোনো ফুলের চাষ করে না। সব ফুল আসে ঢাকা, যশোহর, ঝিনাইদহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, টাঙ্গাইল ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে। আবার কিছু কিছু ফুল ভারত ও থাইল্যান্ড থেকেও আসে। তাই ফুলের দাম সাধারণত একটু বেশি হয়ে থাকে। ফুলের মূল্য নির্ধারণে ফুলবিক্রেতারা ফুলের মৌসুমে এক ধরনের দাম নির্ধারণ করে এবং অমৌসুমে তুলনামূলকভাবে বেশি দাম নির্ধারণ করে। সাধারণত মার্চ থেকে আগস্ট এই সময়টা তেজি মৌসুম। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি হলো মন্দা মৌসুম। ফুলের ঝুড়ি, ফুলের তোড়া ইত্যাদির অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে ঝাউপাতা। এই ঝাউপাতা বেশি আসে যশোহর থেকে।

১ বস্তা ঝাউপাতা ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকায় বিক্রি হয়। মাঠপর্যায়ের জরিপ হতে জানা যায়, গাঁদাফুল ৪৫টির ক্রয়মূল্য ৪ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য ৮ থেকে ১০ টাকা, রজনীগন্ধা ১টি স্টিক ক্রয় ১ টাকা থেকে ১ টাকা ৩০ পয়সা বিক্রি ৮ থেকে ১২ টাকা, গোলাপ প্রতিটি ক্রয় ১ থেকে ২ টাকা বিক্রি ৫ থেকে ১০ টাকা বা আরও বেশি, জারবারা থাইল্যান্ড থেকে আসা ক্রয় ১৫ থেকে ২৫ টাকা বিক্রি ৩০ থেকে ৫০ টাকা ইদানীং টাঙ্গাইলেও জারবারা চাষ হচ্ছে। গ্লাডিওলাস থাইল্যান্ড থেকে আসা প্রতিটি স্টিক ক্রয় ১০ থেকে ১৫ টাকা বিক্রি ২৫ থেকে ৩০ টাকা। ইদানীং গ্লাডিওলাস ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেও চাষ হচ্ছে। হলুদ গোলাপ প্রতিটি ক্রয় ৩ থেকে ৪ টাকা বিক্রি ৬ থেকে ১০ টাকা। সাদা গোলাপ প্রতিটি ক্রয় ৪ থেকে ৫ টাকা বিক্রি ৭ থেকে ১০ টাকা, অর্কিড প্রতিটি স্টিক ক্রয় ১৮ থেকে ২৫ টাকা বিক্রি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বেলীফুল ১টি ক্রয় ১ থেকে ১ টাকা ২০ পয়সা বিক্রি ২ থেকে ৫ টাকা, গাজরা মালা ক্রয় ৬ থেকে ৮ টাকা বিক্রি ১২ থেকে ১৫ টাকা, সিলসিলা যশোহর থেকে আসা ক্রয় ১টি গোছা ৩৫ থেকে ৪২ টাকা বিক্রি ৪০ থেকে ৫০ টাকা, চন্দ্রমল্লিকা ক্রয় ১০ থেকে ১৫ টাকা বিক্রি ২০ থেকে ২৫ টাকা, গন্ধরাজ ক্রয় ৩৫ থেকে ৪৫ টাকা বিক্রি ৫০ থেকে ৬০ টাকা, লিলি ক্রয় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা বিক্রি ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, ডালিয়া ক্রয় ১৫ থেকে ২০ টাকা বিক্রি ২৫ থেকে ৩০ টাকা।

কনে সাজানোর ক্ষেত্রে নিম্নবিত্তরা ২০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে ফুল কিনে নিয়ে যান। মধ্যবিত্তরা ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকায় এবং উচ্চবিত্তরা ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে কনে সাজানোর ফুল কিনে থাকেন। গাড়ি সাজানো হয় ১,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে। উপহারের তোড়ার ক্ষেত্রে হাতে দেওয়ার তোড়া ১০০ থেকে ৫০০ টাকা, বড় তোড়া ৩০০ থেকে ৫,০০০ টাকা। বাসরঘর সাজানোর ক্ষেত্রে

নিম্নবিত্তরা ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকার মধ্যে, মধ্যবিত্তরা ৩,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকার মধ্যে এবং উচ্চবিত্তরা ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকার মধ্যে বাসরঘর সাজিয়ে থাকেন। বিয়ের স্টেজ প্রকারভেদে সর্বনিম্ন ৩,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার মধ্যে সাজানো হয়ে থাকে। চট্টগ্রামের প্রচলিত ঘোড়ার গাড়ি সাজানো হয় ৩,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে।

ফুলের বর্তমান বিপণন ব্যবস্থা

ফুলের দোকানগুলোর ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সাংগঠনিক কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এদের কোনোটির বয়স ২০ বছরের বেশী নয়, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি দোকানই মালিক সরাসরি তত্ত্বাবধান করে থাকেন। নিয়োজিত কর্মচারী ও কর্মকর্তার সংখ্যা ৭ জনের বেশী হয়। কারিগরদের প্রত্যেকেই দৈনিক বেতনভুক্ত। ফুল ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনাটি চার স্তারবিশিষ্ট। যথা: মালিক→কর্মকর্তা→ কর্মচারী→ কারিগর। প্রতিটি দোকানই দৈনিক ৮ থেকে ১৬ ঘণ্টা খোলা রাখা হয় এবং সপ্তাহের প্রতিদিনই খোলা থাকে। ফুল ব্যবসায়ে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর বয়স খুবই কম, ফলে এদের ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত দুর্বল। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের মালিকানাই একক ধরনের, অংশীদারী মালিকানা ২/১টিতে বিদ্যমান। ফুল ব্যবসায়ে সরবরাহ প্রাপ্তির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানই নিজস্ব পরিবহন ব্যবহার করে না। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় এই যে, এ ব্যবসায়ে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনো বীমা ব্যবস্থা নেই। ফুল দোকানির অধিকাংশই ঐতিহ্যগতভাবে এ ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। তবে দু'তিনজন উদ্যমী শিক্ষিত তরুণ এ ব্যবসায়ে এসেছেন বলেও জানা যায়। দোকানের মালিকানা স্বত্ব প্রত্যেকেরই নিজস্ব, তবে ভাড়া হিসেবে গড়ে প্রত্যেককে মাসিক গড়ে ৫,০০০ টাকা করে দিতে হয়। কারো মূলধনই চার লাখ টাকার উর্ধ্বে নয়; আবার মোট মূলধনের ৩/৪ ভাগ স্থায়ী প্রকৃতির। তাছাড়া চলতি মূলধন হিসেবে প্রত্যেকেরই কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা রয়েছে। দোকানিদের অধিকাংশই (৬০%) এস.এস.সি পাশের নিচে।

বণ্টন পদ্ধতি

প্রতিটি দোকানেই কম-বেশি বিভিন্ন প্রকার ফুল ক্রেতার চাহিদানুসারে রাখা হয়। ফুল ব্যবসায়ে মধ্যস্থ কারবারীদের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কমই বলা যায়। একমাত্র পাইকার ছাড়া অন্যান্যদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ফল সাধারণত ঢাকা (সাভার, ধামরাই ও ঢাকার বিভিন্ন নার্সারি), যশোহরের ঝিকরগাছা এবং চট্টগ্রামের চকরিয়া ও হাটহাজারী থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ২/৩ জন পাইকার দেশের বাইরে (ভারত) থেকে রজনীগন্ধা, ফুলের চারা, বীজ, সার সংগ্রহ করে থাকে। সরবরাহ প্রাপ্তিতে নগদ ও ধার–দু'প্রক্রিয়াই বিদ্যমান। অন্যদিকে সরবরাহ ব্যয়ের মধ্যে বিভিন্ন মধ্যস্থ-কারবারীদের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

বিআরটিসি বাসের ছাদে করে পরিবহন খরচ কম পড়ে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত পরিবহন ব্যবস্থায় খরচ বেশী বলে জানা যায়। ফুল ব্যবসায়ের বণ্টন প্রণালী ছক: ১-এ দেখানো হলো।

ছক: ১

ফুল ব্যবসায়ের বণ্টন-প্রণালী

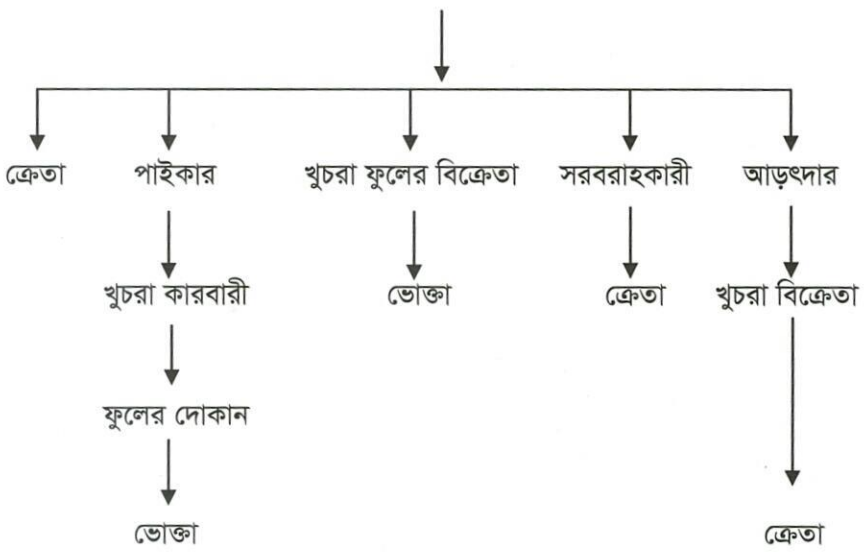

উৎস: মাঠজরিপ

ফুল উৎপাদনকারী হতে ভোক্তার কাছে পৌছে দেওয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ প্রণালীটি হলো: উৎপাদনকারী হতে পাইকার। পাইকার হতে খুচরা কারবারী। খুচরা কারবারী হতে ফুলের দোকান এবং ফুলের দোকান হতে ভোক্তা। এভাবে বিভিন্ন বণ্টন প্রণালীর মাধ্যমে ফুল ভোক্তার হতে পৌঁছে যায়।

বিপণন নীতি

খুচরা হিসেবে ফুল ব্যবসায়ীদের বিপণন নীতি হলো সংগ্রহ-ব্যয় সর্বনিম্ন রেখে বিক্রয়মূল্য ধার্য করা। প্রতিটি দোকানেরই ব্যবসায়ের সময়কাল বেশী নয় বিধায় এদের সুনির্দিষ্ট কোনো বিপণন নীতি নেই। খোলা ফুলের পাশাপাশি মোড়ককৃত ফুলের বিক্রয়ও পরিলক্ষিত হয়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি কৌশল হলো ফুলকে এর রং ও ছোট বড় অনুসারে সাজানোর ব্যবস্থাগ্রহণ। টাটকা ও রংযুক্ত ফুলকে আলাদা করে অধিক

মূল্য ধার্য করা হয়। ফুল বিক্রেতাদের কারোরই কোনো সুনির্দিষ্ট প্রসারনীতি নেই। তবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই বিক্রয়বৃদ্ধির জন্য কতিপয় কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। এ কৌশলগুলোকে ব্যক্তিকপর্যায়ের বিক্রয়ের মধ্যে ফেলা যায়। যেমন: ক্রেতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, ক্রেতাকে ফুল ক্রয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা এবং ক্রেতার পছন্দের দিকটি বিবেচনা করে মোড়ক করে দেওয়া প্রভৃতি।

তবে রোজা, চাঁদরাত (ঈদের আগের রাত), ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১লা বৈশাখ, ১লা জানুয়ারি এবং পুজোর সময়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করবার সময় দোকানদাররা বিভিন্ন ধরনের ব্যানার তৈরি করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে টাঙিয়ে থাকে। ক্রেতারা যেহেতু দরকষাকষি করে থাকে, সেহেতু অধিকাংশ খুচরা দোকানে এক দামে ফুল বিক্রি হয়ে থাকে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানগুলোতে মান নির্ধারণ নীতি অনুসারে বড়, তরতাজা, সুন্দর ইত্যাদি আলাদা আলাদা দামে বিক্রি হয়। ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিক্রয়োত্তর সেবাপ্রদান এখনও দৃশ্যমান নয়। অন্যদিকে ফুলকে পচনশীলতা থেকে রক্ষা করারও কোনো ব্যবস্থা তেমন দেখা যায় না।

ফুল ব্যবহারের বর্তমান প্রবণতাসমূহ

মাসিক ফুল ক্রয়ের হার: ভোক্তা জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ক্রেতাদের মধ্যে ৬৬%ই মহিলা এবং ৩৪% পুরুষ। আবার মাসে একবারও ফুল ক্রয় করে না এমন ক্রেতার সংখ্যা ৩১%, অন্যদিকে প্রতিমাসে ৩/৪ বার ফুল ক্রয় করে এমন ক্রেতার সংখ্যা ৩২% (সারণি: ১)। এ পর্যালোচনা থেকে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, নাগরিক জীবনের একটা বিরাট অংশ এখনো ফুল ক্রয়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

সারণি:১

ক্রেতার লিঙ্গ অনুসারে মাসিক ফুল ক্রয়ের হার

লিঙ্গ/ক্রয়ের হার	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)
০-০	১৫	১৬	৩১
১-২	-	২১	২১
৩-৪	১০	২২	৩২
৫-৬	৩	৩	৬
৭-৮	৪	-	৪
৯-১০	২	৪	৬
	৩৪%	৬৬%	১০০%

উৎস: মাঠজরিপ।